ভিন্ন জীবিকাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বাঙালিদের ইতিহাস (১৮০০-১৯৫০)

রাকেশ জানা

ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী পাওয়ার মাত্র চার বছর পরে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ তারিখে কোম্পানির বিলাতে অবস্থিত ডিরেকটররা এখানকার কাউনসিলকে আদেশ দিল—'বাঙ্গলার রেশম-বয়ন শিল্পকে নিরুৎসাহ করে মাত্র রেশম তৈরির ব্যবসায়কে উৎসাহিত করা হোক।' শীঘ্রই অনুরূপ নীতি তুলাজাত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হল। বলাই বাহুল্য এই কৌশলী পদক্ষেপ বাংলার শিল্পকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যেই কায়েম করা হয়েছিল। কৃষি ছাড়াও সে সময় গ্রামবাংলার সমৃদ্ধির উৎস ছিল নানা রকমের শিল্প। যৌথপরিবার ভিত্তিক ভিন্ন জাতব্যবসার সঙ্গে যুক্ত গ্রামবাসীর দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী ও পালাপার্বনে দ্রব্যাদি নিজেরাই তৈরি করতো। এক কথায় বলতে গেলে তারাই ছিলেন আমাদের দেশের প্রাচীন technologists। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভতে বিদেশী দ্রব্যের অনুপ্রবেশে বাঙালি তার কৌলিক বৃত্তি হারিয়ে ফেলে। তা যাই হোক অষ্টাদশ শতাব্দীতে নীল, তুলো, পাট, রেশম প্রভৃতি ব্যবসাই ছিল প্রধান, ফলে ব্যবসা সূত্রে এই অঞ্চলে বেশ কিছু কুঠির স্থাপন করা হয়। মালিকেরা কুঠি স্থাপন ও তার পরিচালনার ভার অর্পণ করতেন 'দেওয়ান'কে। আবার ব্যবসায়ী সাহেবরা ব্যবসা পরিচালনার ভার দিতেন 'বেনিয়ান' ও 'মুৎসুদ্দি'দের। এই সব কুঠির 'দেওয়ান' নিযুক্ত হতেন উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের ব্যক্তিরা। "এই প্রথম উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দু 'ম্লেচ্ছ' সাহেবদের কুঠিতে নগদ বেতনে চাকরি নিল। তারা গ্রাম থেকে বড়ো গঞ্জে বা শহরে এল, নগদ বেতন পেল, কাঁচা টাকার ঘুস লুটতে লাগল, অপরিমিত অর্থবান হয়ে নতুন 'শ্রেণী'র পত্তন ঘটাল" (দেবীপদ ভট্টাচার্য। উপন্যাসের কথা। বুক পাবলিশিং। কলকাতা। মে ১৯৬১। পৃঃ-১০৬-১০৭)। যার নাম মধ্যবিত্ত সমাজ। কলকাতা শহরই এই সমাজের কেন্দ্রমণি হয়ে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে আবার ফরাসীদের 'ফরাশডাঙ্গা' বা চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, হাটখোলার দত্তদের অন্নদাস, কলকাতার বিখ্যাত ধনকুবের রামদুলাল সরকার, হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ধনী। কেননা আঠারো শতকের পূর্বের নবাব ও মহারাজাদের প্রাধান্যের হ্রাস ঘটলো এবং দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, হৌসদার প্রভৃতি নবোদিত ধনী সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা ও প্রভাব বহুগুণ বর্ধিত হল। আবার কেউ কেউ রাজা সহসা 'মহারাজ' খেতাব পেলেন এবং অসাধু পন্থায় অর্জিত অর্থে জমিদারিও কিনলেন। বলতে গেলে সেদিন এই অর্জিত অর্থ খাটাবার বা শিল্পে নিয়োগ করবার অনুকূল সুযোগ বা সামর্থ ছিল না। উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রে শিল্প বাণিজ্যের প্রতি বাঙালির অনীহা বা নিস্পৃহতা বা উদাসীনতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

তা যাই হোক দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ ও রামদুলাল দে ছাড়া আর কোন বাঙ্গালিকে সেসময়ে স্বাধীন ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করতে দেখা যায়নি। 'সম্বাদভাস্কর' এ প্রকাশিত ১৮৪৯ সালে একটি চিঠি থেকে জানা যায় বড়লোক বাঙালীর প্রধান কাজ বিলেতী হুণ্ডি ও কোম্পানীর কাগজ কেনা বেচা করা এবং অত্যাধিক সুদে টাকা খাটানো। ১৮৫৬ সালে 'তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকা' বলেছে, বাংলাদেশে (অখণ্ড বঙ্গে) ব্যবসায়ীর চেয়ে বেতনভুক চাকুরিজীবির সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা কিভাবে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক সংস্থাপন করে, সেখানকার কারখানায় গিয়ে তাদের কার্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখে শিখে আসছে এবং দেশে নতুন ব্যবসা ফাঁদছে; তার দৃষ্টান্ত দিয়ে বাঙালিকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক এর আবির্ভাবে ভারতবর্ষের দুঃখ ঘুচেছিল। এই সময় চার্টার আইনের দ্বারা শিক্ষাখাতে ব্যয় এর অর্থ ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আদেশ পায়। তবে এই শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল সরকারি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ প্রশাসনিক কর্মচারী প্রস্তুত করা। প্রশাসন ভিন্ন ইংরেজদের বাণিজ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়োগ এর জন্যও ইংরেজি ভাষা জানা কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। আর প্রয়োজন ছিল ডাক্তার, আইনজীবি, শিক্ষকদের। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও বোম্বাই এর এলফিনস্টোন কলেজ উইলিয়াম বেন্টিংক এর দ্বারাই স্থাপিত হয়। তবে এর পূর্বে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে মিশনারিগণ শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন করেন যা দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার উৎকৃষ্ট শিক্ষায়তন। এই শ্রীরামপুর মিশন এর উদ্যোগে তৈরি ছাপাখানা দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচনার দ্বারা বাঙালীর জ্ঞান অর্জনের চাহিদা মিটিয়ে ছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় অসাধারণ সৎসাহস দেখিয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্ত নামে জনৈক ব্যক্তি। কারণ সেকালে মেডিক্যাল কলেজে আনাটমি শিক্ষার জন্য শব ব্যবচ্ছেদ করবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আচারনিষ্ঠ হিন্দু সমাজে মৃত ব্যক্তিকে ছুঁলে জাত যাওয়ার ও একঘরে হওয়ার ভয় থাকতো। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে মহিলাদের শিক্ষার জন্য নেটিভ ফিমেল স্কুল (পরবর্তীকালে যার নাম হয় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যা 'উডের ডেস্প্যাচ' নামে পরিচিত এই নির্দেশনামায় ভারতের ইংরেজ সরকারকে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করতে বলা হয়। এতে স্কুল পর্যায়ে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাব্যবস্থা করা হয় এছাড়া কলেজ পর্যায়ে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশের উপর ভিত্তি করেই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয়দের বিশেষত শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে যুক্তিবাদ, স্বাধীনচিন্তা, উদারনীতি প্রভৃতি আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকরণ হল। তাছাড়া প্রশাসনিক সুবিধা এবং বাণিজ্যের সুযোগবৃদ্ধির জন্য ইংরেজরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ, নদীপথে স্টীমার চালনা, টেলিগ্রাম, ডাক-চলাচল প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তণ করেছিল, সেখানেও অনেক বাঙালিদের নিয়োগ হয়েছে।

এই সময়ে অসংখ্য প্রেস গড়ে উঠতে থাকে কোলকাতা ও তার আশেপাশে অঞ্চলগুলিতে, অনেক পত্রিকার আবার নিজেদের প্রেসও ছিল। বাংলায় ছাপাখানার আবির্ভাবে প্রথম প্রতিঘাত গিয়ে পড়ে পুঁথি লেখকদের উপর। অবশ্য প্রথম প্রথম গোঁড়া নিষ্ঠাবান সমাজ মুদ্রিত পুস্তক মেনে নেয়নি। তার কারণ বোধ হয় ছাপাখানা বিলাতী যন্ত্র বলে, এর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতো সমাজ। তবে এই বিদ্বেষ খুব বেশি দিন টেকে নি। "ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পূর্বেই ছাপা বইয়ের প্লাবন এনে দিয়েছিল শিক্ষাজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তখন থেকেই উপজীবিকার উপায় হিসাবে পুঁথিলেখা তার সূত্র হারিয়ে ফেলে" (বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন। ড. অতুল সুর। সাহিত্যলোক। কলকাতা। ১৯৮৬। পৃঃ-৩০১)। তবে এতে এক শ্রেণীর লোক যেমন কাজ হারালো ঠিক তেমনই ছাপাখানা নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করলো। পরবর্তীকালে ছাপাখানারও বিকাশ ঘটলো। লাইনোটাইপ, মনোটাইপ প্রভৃতি যন্ত্রের আবিস্কারে মুদ্রণযন্ত্রও প্লাটেন প্রেস থেকে রোটারি প্রেসে

পরিণত হল। সচিত্র বই ছাপাবার জন্য হাফটোন ব্লক তৈরি হতে লাগলো। অফসেট প্রিন্টিং-এর প্রবর্তন হল। এই সব কাজের জন্য দক্ষকর্মীর প্রয়োজন হল। তাছাড়া ছাপার কালি ও কাগজের শিল্পেও প্রচুর লোক নিযুক্ত হল।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন এর মত রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট এসেই ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও তার ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার ব্রিটিশ সংস্থা সমূহের হাতে তুলে দেওয়ার স্বপক্ষে একটি আইন জারি করেন (১৯০৩)। এছাড়াও তিনি ভারতীয় সংবাদ পত্রিকাগুলিকে অফিসিয়াল সিক্রেটস আইনের আওতায় এনেছিলেন। তবে শাসনের সুবিধার অজুহাত দেখিয়ে ১৯০৫ সালে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙ্গালিরা রুখেদাঁড়াতে ভুল করেনি। আন্দোলনকারীরা খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে এক বিরাট জনসভায় (১৭ই জুলাই, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে) বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলা ছাত্রসমাজ এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। বয়কট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল—বিলাতী পণ্য বয়কট। মানে ম্যাঞ্চেষ্টারে প্রস্তুত বস্ত্রাদি বর্জন করে ইংরেজদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ তৈরি করা। আর এই সুযোগে প্রতিযোগিতায় মৃতপ্রায় শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা। ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলন থেকে পৃথক করার জন্য কার্লাইন ছাত্রদের জলপানি (scholarship) কেড়ে নেওয়ার আইন জারি করেন। সরকারের দমন নীতির ফলে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল-কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে দেশহিতৈষীরা এগিয়ে আসেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর 'ডন সোসাইটি'-র (১৯০২) নাম উল্লেখযোগ্য। সতীশচন্দ্র ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গের উৎসাহে ও অর্থনৈতিক সহায়তায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৬ই নভেম্বর, ১৯০৫) গঠিত হয়। মাতৃভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, দেশীয় ও পশ্চ্যাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও আদর্শ বিস্তার, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি এই পরিষদের আদর্শরূপে বর্ণিত হল। এই পরিষদের অধীনে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—বঙ্গীয় জাতীয় মহাবিদ্যালয় (Bengal National College) ও বঙ্গীয় কারুমহাবিদ্যালয় (Bengal Technical Institule) দুই ধরনের পাঠ্যক্রম চালু করে।

তবে 'ডন সোসাইটি'র পূর্বে উনিশ শতকের বাংলায় প্রথম জাতীয় শিল্প বিদ্যালয়ের সূচনা করেন মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এরপূর্বে দেশে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান বা Indian Association for Cultivation of Science-এর (১৮৭৬) গঠন করেছিলেন। মহেন্দ্রলালের কিছু পরে বৈজ্ঞানিক গবেষনায় ঔপনিবেশিক প্রতিকুলতা সত্ত্বেও দু'জন বিজ্ঞানী যাঁরা IES (Indian Educational Service) পাস করে কলেজের প্রফেসারবৃত্তি নিয়েও গবেষনায় নিযুক্ত থেকেছেন তাঁরা হলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রতিকূল পরিবেশে তাঁদের গবেষণা বাঙালিদের গর্ব করার মত। জগদীশের চাকরি ছেড়ে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা (১৯১৬) ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে ফলপ্রসু হয়েছিল। অপরদিকে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯০১ সালে 'Bengal Chemical and Pharmaceutical Works' প্রতিষ্ঠা করে স্বদেশী ব্যবসায় উদ্যোগ নেন।

বাঙালিদের স্বদেশী চিন্তা, শিল্প ভাবনা ও দেশীয় প্রযুক্তির উদ্যোগ ১৮৬৭-এ 'হিন্দু মেলা'র আমল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তা যাই হোক ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্বদেশী উদ্যোগে জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ বছরেই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট (পরবর্তীকালে ১৯২৮-এ যার যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয় নাম হয়) স্থাপিত হলে সাধারণ ছেলেরা ঐ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ও নানা কারিগরি বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তবে একথাও ঠিক যে এই প্রতিষ্ঠান

থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রদের কর্মসংস্থানের সুযোগও কম ছিল। বঙ্গভঙ্গ বিপ্লবী আন্দোলন ভারতছাড় আন্দোলনের পীঠস্থান হিসেবে সারা বাংলাদেশ জড়িয়ে পড়লে বাঙালীরা ব্রিটিশ আনুকূল্যলাভে বঞ্চিত হয়, ব্যাংকগুলি বাঙালি শিল্পপতিদের ঋণ দিতে অস্বীকৃত হয়। তাছাড়া স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য অন্যান্য প্রতিকূলতাও রয়েছে যেমন বাঙালীরা এসময় ব্যবসা ছেড়ে ভূসম্পত্তি ক্রয়ে মন দিয়েছিল। আবার বাঙালিদের বিরাট একান্নবর্তি পরিবার থাকায় সঞ্চয় কম, তাই ব্রিটিশ কিম্বা মাড়োয়ারি শিল্পপতিদের সঙ্গে মূলধনে পাল্লা দেওয়া তো দূরের কথা লড়াইটাও বেমানান ছিল। এছাড়াও ১৯২৮-৩৪ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক মন্দা, চল্লিশের দশকে মন্বন্তর, দাঙ্গা ও বঙ্গভঙ্গের পর উদ্বাস্তু শরণার্থীদের ভিড় বাঙালিদের সর্বস্বান্ত করেছিল। এমত অবস্থায় সীমিত মূলধন নিয়ে বাঙালি ব্যবসায়ীরা পঙ্গুত্বের দশা প্রাপ্ত হয়েছিল। তবুও নিরাশার মধ্যে আশার আলোর সন্ধানে অনেক বাঙালি স্বল্প মূলধনে ও ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

কারিগরি বিদ্যার ইতিহাসে জলযান বিদ্যায় জানা যায়—ভারতে প্রথম স্টিমার তৈরি হয় ১৮১৯ সালে অযোধ্যার নবাব গাজিউদ্দিন হায়দারের প্রচেষ্টায়। এর কিছু সময় পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচেষ্টায় জাহাজ নির্মাণ শুরু হয়। গঙ্গার বিভিন্ন তীরবর্তী অঞ্চলে ডক গড়ে ওঠে। সেসময় বাংলার নদীতে যেসব জাহাজ ও স্টিমার চলতো তাতে দেশীয় কর্মী নিয়োগ হতো, এই সুযোগে বাংলার উৎসাহী কর্মীরা জাহাজের খুঁটিনাটি কারিগরি বিদ্যা শিখে নেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা এই বৃত্তি নিতে বেশি উৎসাহী ছিলেন। ১৮৭৬ সালে চট্টগ্রামের হানিফ সারেং স্টিমারের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হলে তাঁর পদবী থেকেই বাংলার স্টিমারের সর্বাধিনায়ককে 'সারেং' বলা শুরু হয়।

উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকেই প্রসন্নকুমার ঘোষের প্রচেষ্টায় ট্রাইসাইকেল নির্মিত হচ্ছে। হেমেন্দ্র মোহন বোস নামে এক বাঙালী ইংরেজদের কাছে সাইকেলের কারিগরি ও চালাবার বিদ্যা শিখে অপরাপর ব্যাক্তিবর্গকে শেখান। তিনি তাঁর 'গ্রেট ইস্টার্ন মোটর কোম্পানিতে বহু বাঙালি যুবক নিয়োগ করেছিলেন। তবে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর এই কোম্পানী বন্ধ হয়ে যায়। সেসময় পাঁচ টাকা মজুরি নিয়ে সাইকেলের চাকার লিগ সারাতেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের এক পাচক। ১৮৯৬ সাল থেকে কলকাতায় মোটর গাড়ির প্রচলন হয়। ১৯২১ সালে পায়ে টানা রিক্সাও কলকাতায় ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তবে বাংলার মোটর কারিগরি বিদ্যার ইতিহাসে বাঙালি দক্ষ কারিগর হিসেবে বিপিনবিহারী দাসের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁর তৈরি স্বদেশী গাড়ি যার মাত্র তিনটি যন্ত্রাংশ ছিল বিদেশী (স্পার্ক প্লাগ, কারবুরেটর, টায়ার)-এগুলি বাদ দিয়ে পুরো গাড়িটা তৈরি করে বেনারসের হিন্দু ইউনিভার্সিটিকে তিনি বিক্রি করেন। শোনাযায় মোতিলাল নেহেরু ও মদনমোহন মালব্যের মতো দুই মহান ব্যক্তিত্ব এই গাড়ির আরোহী হয়েছিলেন। গরীব বিপিনবিহারী পরবর্তীকালে কলকাতা কর্পোরেশনের জন্যও গাড়ি তৈরি করেছিলেন। তবে এদেশের ট্যাক্সির প্রথম মিটার বানান পঞ্চানন আদিত্য নামে জনৈক ব্যাক্তি।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮-এ জুন বাংলার মাটিতে প্রথম ট্রেন বা 'কলেরগাড়ি' চলাচল করে হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত। যদিও ভারতবর্ষে প্রথম ট্রেন চলে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে। এরপর ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেলপথের বিস্তার ঘটে। রেলের লাইন পাততে ও রেলব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ভারতীয়দের মধ্যে থেকেই প্রচুর কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগ করা হতো, ফলে রেল বিস্তারে মানুষের সামনে খুলে গেল জীবিকার এক নতুন পথ। এই সময় কোন কোন বাঙালি সরাসরি রেলের কাজে যুক্ত না থেকে এজেন্ট হয়ে নাম কিনেছিলেন, তন্মধ্যে রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তবে ইউরোপীয় কর্মচারিদের বেতন অত্যাধিক হওয়ার দরুন রেলকোম্পানী এই ব্যয়ভার মেটাতে হিমসিম খায়, প্রয়োজন হয় এদেশীয় কর্মচারীর। ফলে স্বল্প বেতনে এদেশীয়দের কাজ করালে রেলকোম্পানীর লোকসানেরও ঘাটতি হয়। রেলের এই দুঃসময়ে রেল ম্যানেজার

করা হয় রামগতি মুখোপাধ্যায়কে তাঁর দক্ষতা ও উদ্যোগে রেলকোম্পানী ঘুরে দাঁড়ায়। সাদা চামড়ার মানুষদের জাত্যাভিমানের কারণে এতদিন বাঙালিদের ড্রাইভার বা গার্ডের মত গুরুত্বপূর্ণ চাকরি দেওয়া হোত না। তবে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দেশীয় গার্ড নিযুক্ত হন চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতের প্রথম বৈমানিক ছিলেন ইন্দ্রলাল রায়। তিনি ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর কমিশন অফিসার হিসেবে যুদ্ধে যান। সেখানে জার্মানদের আক্রমণে গুরুতর আহত হন ও ভাগ্যজোরে রক্ষা পান। পরবর্তীকালে আবার ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুনে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ১৮ই জুলাই জার্মান গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ বিমান যোদ্ধার সম্মানে ভূষিত করেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীর জাদুঘরে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত যাবতীয় বস্তু সংরক্ষিত রয়েছে। তবে আকাশযান বিদ্যায় বাঙালিদের অগ্রগতি দেখা যায় স্বাধীনতা উত্তরকালে বিমানাচার্য সুবোধচন্দ্র মৈত্রের উদ্যোগে।

প্রতিলিপি শিল্পে বাংলার মুদ্রণ শিল্পের জনক পঞ্চানন কর্মকারের অবদান বাংলা সাহিত্য জগতে অনস্বীকার্য। তাঁর তৈরি বাংলা অক্ষরের সহায়তায় সেসময় শ্রীরামপুর ছাপাখানায় প্রচুর পত্র-পত্রিকা-পুস্তক ছাপা হয়। এই শ্রীরামপুর কারখানার উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন অতি দরিদ্র কামার পরিবারের সন্তান গোলকচন্দ্র নন্দী। যদিও শোনা যায় তাঁর এই সাফল্যের পেছনে উইলিয়াম কেরি ও হাওড়া শিল্পাঞ্চলের জনৈক যন্ত্রবিদ জেমস সাহেবের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

আবার প্রতিচ্ছবি শিল্পে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'ব্লকমেকিং' নাম দিয়ে ছাপ তুলে একই ছবির একাধিক প্রতিচ্ছবি তোলার ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর এনগ্রেভিং রীতিতে রঙিন আলোকচিত্র মুদ্রণ এক যুগান্তকারী প্রকল্প; এতে রঙিন মুদ্রণের নানা প্রকার ডায়াফর্ম যন্ত্র, স্ক্রিন এডজাস্টার যন্ত্র, ডুয়োটাইপ ও টিন্ট পদ্ধতি প্রশংসা ও ব্যাবসায়িক সাফল্য লাভ করে।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফটোগ্রাফির আবিস্কার বার্তা শোনা গেলেও ঐ শতাব্দীর আশির দশকে কালীশ্বর ঘটক নামে এক স্বভাব বিজ্ঞানী ক্যামেরা তৈরির কারিগরি বিদ্যার কৌশলটি একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শিক্ষক ফাদার লাফোঁর সহায়তায় হীরালাল সেন ভারতে তথা বাংলার মাটিতে প্রথম চলচ্চিত্র দেখান। এরপর থেকে চলচ্চিত্র অর্থনৈতিক ইতিহাসে বৃহত্ কলেবর ধারন করে। ভারতে প্রথম বেতার ট্রান্সমিটার যন্ত্রের প্রস্তুত কারক হলেন শিশির কুমার মিত্র, তাঁর সুযোগ্য ছাত্র বৈজ্ঞানিক বামাদাস চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে ১৯৩২-৩৩ সালে 'সিস্টোফোন' নামে এক শব্দ যন্ত্র আবিস্কার করলেন যা অডিও জগতের একটা মাইলস্টোন। তাঁর তৈরি যন্ত্রই ধীরে ধীরে ভারতের সব সিনেমাহলে ব্যবহৃত হয়। বাঙালি হিসেবে প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের সূচনা করেছিলেন নির্বাক চলচ্চিত্র যুগের বিশিষ্ট অভিনেতা এবং চলচ্চিত্রনির্মাতা প্রমথেশ বড়ুয়া মহাশয়। তাঁর 'বড়ুয়া ফিল্মস' সারা ভারতবর্ষে সাড়া ফেলেছিলো। এই জন্য তিনি ১৯২৯-৩০ সালে ইংল্যাণ্ড গিয়ে 'গেলসবরো স্টুডিও' থেকে সবাক চলচ্চিত্র তৈরি করার কারিগরি কৌশল হাতেকলমে শিখে আসেন।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার চর্মশিল্প নামক লাভজনক ব্যবসাটিতে বঙ্গের হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতদিন এই ব্যবসা ছিল মুসলিম সম্প্রদায়েরই দখলে তিনি হরিকিষেন নামে এক পাঞ্জাবি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 'ন্যাশন্যাল ট্যানারী' নামে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে একটি ছোট্ট কারখানা ক্রয় করেন। বিরাজমোহন দাস নামে তাঁর এক মেধাবী ছাত্রকে এই বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান অর্জনের জন্য ইংল্যাণ্ডের লিডস ইউনিভারসিটিতে পাঠান। বিদেশ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমস্ত সামাজিক বাধা ও রক্ষণশীল ব্যাক্তিবর্গের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিরাজমোহন তাঁর কর্মতৎপরতায় 'ন্যাশন্যাল ট্যানারী'র শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। এই ন্যাশন্যাল ট্যানারীতে বহু হিন্দু কারিগর সামাজিক বাধা ও জাতি চ্যুত হওয়ার ভয়কে জয় করে চর্মশিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। নীলরতন সরকারের

এই ট্যানারীকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দূষণমুক্ত করেছিলেন। এই ট্যানারী ছাড়াও তিনি সার ও সাবানের কারখানা স্থাপন করেন।

দারিদ্র্যের কারণে প্রথাগত শিক্ষা না পেয়েও ছোট-খাটো বিভিন্ন কলকারখানায় হাতেকলমে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করেন রাজকৃষ্ণ কর্মকার নামে একজন সহজাত বাঙালি মিস্ত্রী। মাত্র সতের বছর বয়সে দক্ষতার জন্য শিবপুরে অপকার কোম্পানীর জাহাজে কাজ পান। পরবর্তীকালে পলতার জলকল, ঘুসুড়ির চটকল, বালির কাগজকল, কাশীপুরের অস্ত্রতৈরির কারখানা, টাঁকশালে মুদ্রা তৈরির কাজ, সিমলায় বাষ্পীয় বয়লার স্থাপন, নেপালে অস্ত্রতৈরি ও টাঁকশালের কাজ প্রমুখ বহুকাজে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

কয়লা শিল্পে বাঙালি উদ্যোগের অন্যতম পথিকৃত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮২৫-৩০ এ প্রধান প্রধান ব্রিটিশ এজেন্সিগুলির পতন ঘটলে পামার, আলেকজেণ্ডার প্রভৃতি কোম্পানির কয়লাখনিগুলি তিনি অল্পমূল্যে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের তরফ থেকে কিনে নেন। ১৮৮০-র পর বাঙালি উদ্যোগে কয়লা শিল্পে যাঁরা নাম করেন তাঁর হলেন-লায়েক ব্যানার্জি, নিবারণ সরকার, যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ পণ্ডিত প্রমুখ।

এই খনি প্রসঙ্গে আসে ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদদের পথিকৃত প্রমথনাথ বসুর নাম, তিনি ১৮৮০ সালে 'জিয়লজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'-তে চাকরি পান। তাঁর ২৩ বছরের চাকুরী জীবনে তিনি মধ্যপ্রদেশের ধুল্লী এবং রাজহারা লৌহখনি, কালিম্পং-এ কয়লা, সিকিমে তারা, দুর্গ-এ ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহআকর, কাশ্মীরে বেলে পাথর থেকে খনিজ তেল নিষ্কাশন করেন। ১৯০৩-এ ইংরেজ সরকারের ভারতীয়দের প্রতি পদন্নতির বৈষম্যে তিনি অপমানিত হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেন। এরপর আসে তাঁর ও সমগ্র ভারতবাসীর জীবনে ঐতিহাসিক মুহূর্ত যখন ময়ূরভঞ্জের গুরুমহিষানির লৌহস্তর আবিস্কার হয়। তিনি জামশেদজি টাটকে এই খনির সুবিধা নিয়ে সাকচিতে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁরই প্রেরণায় জামশেদজি ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠা করেন, এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত প্রযুক্তিবিজ্ঞানীরা বিদেশে TISCO-তে নিযুক্ত হতেন। ১৯১১ সালে জামশেদজি টাটা ভারতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অনেক দক্ষ লৌহ কারিগরের জন্ম হয়েছিল। এর মধ্যে কাঞ্চননগরের লৌহকারিগর প্রেমচাঁদ কর্মকারের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি উনিশ শতকের সত্তরের দশকে স্থানীয় ইস্পাত দিয়ে এমনসব যন্ত্রপাতি তৈরি করেন, যার সাহায্যে নির্মিত ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু সারা ভরতে খ্যাতি অর্জন করে।

বঙ্গে কাগজ শিল্পের ক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরীর অবদান যেমন অনস্বীকার্য, ঠিক তেমনি পিজবোর্ড শিল্পের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক ছিলেন পরিমল ঘোষ।

বাংলার বুকে কলাই শিল্প ও এনামেল ব্যবসায় নাম করেন মৃগাঙ্কমোহন সুর। তিনি ১৯১৭ সালে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া থেকে এই বিদ্যা শিখে এসে বঙ্গে ব্যবসা শুরু করেন। সেরামিক শিল্প বা চীনামাটির খনিজ 'কেওলিন' পাওয়া যায় বিহারের ভাগলপুরে। সেখানে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কারখানা গড়ে ওঠে। তবে বাংলায় সেরামিক শিল্পের বিস্তারে সত্যসুন্দর দেব ও শশধর রায় এই দুইজন ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮২২ সালে গ্যাসবাতি এসেছিল কলকাতায় তারপর আশির দশকে বিদ্যুৎএর আগমন ঘটে। শিবদাস শীল (মতান্তরে—কালিদাস শীল) তাঁর 'দে শীল আণ্ড কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করে কলকাতায় বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে প্রথম ব্যবসা শুরু করেন। এরপর ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই এপ্রিল মাত্র ২০০ বিদ্যুত্ গ্রাহক নিয়ে সি. ই. এস. সি বিদ্যুত্ ব্যবসা শুরু করে।

কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান নীলমনি মিত্র রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে

ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সরকারি দেশীয় বাস্তুবিদ হিসেবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। গঙ্গার খাল নির্মানের পরিকল্পনা তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড। তবে ব্রিটিশ প্রভুবর্গের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটলে সরকারি চাকুরী ছেড়ে তিনি স্বাধীনভাবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। বাগবাজারের নন্দলাল বসুর বাড়ি, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের প্রাসাদ, এমরেণ্ড টাওয়ার, মহেন্দ্র লাল সরকারের 'কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স' এর মূলভবন তাঁরই নক্সায় নির্মিত হয়।

১৯৩১ সালে তিন বাঙালি যুবক শচিন্দ্রপ্রসাদ সাহা, মধুসূদন মজুমদার, অজিত রায়চৌধুরী ন'দশ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে কলকাতার কালীঘাটে 'শক্তি ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি' নাম দিয়ে প্রথম ব্যাটারি ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে তিন ব্যক্তির মতানৈক্যে এই কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়। এদের মধ্যে বিচক্ষণ শচীন্দ্রপ্রসাদ জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জ্যোতিপ্রকাশ সরকারের কাছ থেকে সীসের সাহায্যে ব্যাটারির প্লেট তৈরি করার তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপর নিজ উদ্যোগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি মেটাল প্লেট তৈরিতে সাফল্য অর্জন করেন। শুধু তাই নয় এতদিন ধরে চলে আসা দেশি বিদেশী ব্যাটারির মেটাল প্লেটের ফাঁক গুলিতে কাঠের সেপারেটারের ব্যবহার করে ব্যাটারি তৈরিতে অভিনবত্ব আনেন।

দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বাঙালি যুবক ফ্রান্স থেকে কাগজ, পিজবোর্ড ও 'ফুরড্রিনিমার' যন্ত্রের কারিগরিবিদ্যা শিখে এসে বরানগরে 'সিটি পেপার এণ্ড বোর্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ' নামে একটি উন্নতমানের কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তাঁকেই অনুসরণ করে বঙ্গে বেশ কিছু যুবক এই ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আবার কাগজ ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান মানিকলাল দত্ত ১৯২৮-২৯ সালে জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পেপার টেকনলজি পাস করে কলকাতায় ফিরে ভারতের কাগজ শিল্পকে আরো উন্নত করেন। তবে পিজবোর্ড শিল্পে যাঁর নাম পথিকৃত্ হিসেবে উঠে এসেছে তিনি হলেন প্রখ্যাত শিল্পপতি পরিমল ঘোষ।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস সি রসায়নের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বসুর নাম করা হয় বাংলার রবার শিল্পের পথিকৃত ও ডাকব্যাগের জনক রূপে।

বাংলায় আধুনিক কাচ উৎপাদন শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষের দিকে। জার্মান দেশ সর্বাধুনিক কাচ উৎপাদনে সে সময় বিশ্বে পরিচিত ছিল। রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বেণীমাধব মুখার্জী নামে এক স্বাধীনচেতা বাঙালি জার্মানী গিয়ে পেট্রল এবং কয়লার সাহায্যে উচ্চতাপ সৃষ্টি করে উন্নতমানের কাচ তৈরির কারিগরি বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। এই বেণীমাধব-এর শিষ্য রাধারমন দাসের কাছেই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল জ্বালানি গ্যাস তৈরি ও কাচ তৈরির কারিগরি বিদ্যা অর্জন করে বিখ্যাত হন এলাহবাদের নিম্নবিত্ত পরিবারের যুবক ননীগোপাল সরকার। তিনি দমদম ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত 'নিউ ইণ্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড'-এ কয়েক বছর চাকরি করার পর বহু কষ্টে অর্থসংগ্রহ করে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানী যান সর্বাধুনিক কাচ শিল্পের কারিগরি বিদ্যা অর্জনের জন্য। দু'বছর পর দেশে ফিরে ব্যবসায়ী রণজিত রায়ের পুঁজির সহায়তায় তিনি ১৯৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর 'সায়েন্টিফিক ইণ্ডিয়ান গ্লাস কোম্পানি' সংক্ষেপে 'সিগকল' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১৮-১৯ সালের দিকে কলকাতায় 'পুঁজিহীন প্রায় দরিদ্র এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী এক বাঙালি যুবক ক্ষীরোদ বিহারী চক্রবর্তীকে ফ্যান তৈরিতে প্রথম উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। ''১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে বাংলা তথা ভারতে তৈরি ক্লাইভ কোম্পানি প্রথম ইলেকট্রিক ফ্যান কলকাতার লিণ্ডসে স্ট্রিটের শো-রুমে দেখা যায়। দু'এক বছরের মধ্যে স্বদেশে তৈরি ক্লাইভ ফ্যানের চাহিদা এত বৃদ্ধি পায় যে বিদেশে তৈরি ফ্যানের বাজার বেশ কিছুটা কোনঠাসা হয়ে যায়'' (জিতেন্দ্রনাথ রায়। বাংলার কলকারখানা ও কারিগরি বিদ্যার ইতিহাস। দে'জ পাবলিশিং। জানুয়ারি ২০০৫। কলকাতা।

পৃ.-১৪৪।)। এই ক্লাইভ কোম্পানীর কারিগর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্লাইভ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আপ্রেন্টিস ট্রেনিং স্কুলও খোলা হয়। প্রথমে পুরুষ কারিগররা ও পরবর্তীকালে মহিলারাও এই প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং নেন। আসলে মেয়েদের দ্বারা আর্মেচারে তার জড়ানোর মতো সূক্ষ্ম কাজ করানো হতো, তাই তারা এ কাজে শিক্ষানবিশ হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনজন বাঙালি সহোদর ভাই সুরেন রায়, কিরণ রায়, হেমেন রায় জার্মানী থেকে বিদ্যুত্ বাতি তৈরির কারিগরি বিদ্যা শিখে, যন্ত্রাংশ আনিয়ে কসবা এলাকায় 'বেঙ্গল ল্যাম্প'-এর কারখানা স্থাপন করলেন। স্বাদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী পণ্য বর্জন হওয়ায় তাঁদের 'বেঙ্গল ল্যাম্প'-এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

উপরিউক্ত কারিগরি বিদ্যাগুলির অনুপ্রেরণায় ও বিজ্ঞানের বিবর্তনের যুগে বর্তমান সমাজ আর নতুন কারিগরি পন্থা সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বাঙালিদের এই কারিগরি বিদ্যার বিবর্তনের ইতিহাসটি হারিয়ে যেত যদি না এই বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হত। এতে বাঙালিদের ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা প্রচেষ্টাগুলি অনুপ্রেরনাদায়ক।